ভাষার ভবিষ্যৎ

সোহিনী ঘোষ

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এর অন্তরালে কান্না-রক্ত-ঘাম ও আবেগ সম্পর্কে আজও আমরা সাধারণত উদাসীন। ক্লাসে পাঠদানের সময়ে প্রসঙ্গত উল্লেখে, আয়োজিত সেমিনারের বক্তৃতায় গম্ভীর তত্ত্ব আউড়ানোয় এবং অতি সাম্প্রতিককালে সরকারি আনুকূল্যে এবং 'রাজনৈতিক' আগ্রহের ফলে 'মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের একটা হিড়িক পড়েছে। সন্দেহ নেই, আজকের বাঙালি 'দিবস পালনে' দড়। অতএব 'মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনেও তার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সবকিছুই তো আর তেমন স্বাভাবিকতায় ধরা দেয় না। ফলে ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ভ্যালেন্টাইন ডে'র ধকল সামলে আবার ২১ ফেব্রুয়ারি 'ভাষা দিবসে'র জন্য তৈরি হয়ে ওঠাটা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই ফেব্রুয়ারি মাসের দুটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' উৎসবের মধ্যে একটির ঝুলি ভরে ওঠে অসীম মনোযোগের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে এবং দ্বিতীয়টি পরিবেশিত হয় আপাত শুষ্কভাবে। অথচ দ্বিতীয়টিও হয়ে উঠতে পারত আকর্ষক, সমানভাবে, যদি রাজনৈতিক দস্তুর ছাপিয়ে উঠে সেটি সত্যি সত্যি হয়ে উঠতে পারত আম-আদমির হৃদয়ের ধন। এই বিশেষ 'দিবস পালনে'র সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আবহ— যদি সে বিষয়টিকে শ্রদ্ধা জানিয়েও একটু সরিয়ে রাখা যায়, যদি শুধুমাত্র ভাষার জন্য, ভাষাকে হৃত গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানুষ নির্দ্বিধায় প্রাণ দিয়েছে— সেকথাটাকে, সে আবেগটাকে সামনে আনা যায়, অতি মমতায় তৈরি করা যায় এক নিরপেক্ষ উৎসবের দিন— তাহলে হয়তো বা একদিন 'ভাষাদিবস' মনোযোগ পাবে। আমরা যদি একথা স্বীকার করে নিই যে কৈশোর ও যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছাড়া ব্যর্থ হবে সব আয়োজন— তবে হয়তো কোনোদিন আমরা একটা সার্থক 'ভাষাদিবস' উদ্‌যাপিত হতে দেখব। তা নয়তো সমস্ত প্রচেষ্টা-উদ্যোগ শুধুমাত্র আলোচনাসভাকেন্দ্রিক হয়ে উঠে নীরক্ত হয়ে যাবে ক্রমশ। ভয়ে-ভাবনায়-আশংকায় আছি থাকি।

খুব সংক্ষেপে নিতান্ত দু-এক কথায় যদি সাতচল্লিশের দেশভাগ বা আরও স্পষ্টভাবে বাংলাভাগের ইতিহাস বলা যায় তাহলে হয়তো এভাবেও বলার চেষ্টা করা যেতে পারে যে— ভারতবর্ষে বহুদিন যাবৎ হিন্দু-মুসলমানে বিভাজন ছিল।

সামাজিকভাবেই ছিল। মধ্যযুগের কাব্যে তার প্রমাণ আছে। এই বিভাজনের ঝিমোনো আগুনে প্রথম রাজনৈতিক হাওয়া লাগে 'বঙ্গভঙ্গ'-এর সিদ্ধান্তে (১৯০৫)। বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিকভাবে রদ হয় বটে (১৯১১)— প্রশাসকের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিন্তু ততদিনে ঘটে গেছে। 'মুসলিম লিগ' প্রতিষ্ঠা (১৯০৬) মুখ্য ঘটনা হলেও, বাঙালি মুসলমানের অভিমান ক্রমশ নানা ঘটনায় প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। বিশেষত পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান— তারা দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং বিভিন্ন কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। অথচ, পূর্ববঙ্গের অর্থনীতিকে প্রভাবিত এবং পরিচালিত করে সংখ্যালঘু হিন্দু জমিদার, কুসীদজীবী, মুৎসুদ্দি, মহাজন। প্রশাসন প্রস্তাবিত বাংলাভাগের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত হিন্দুদের, লাভবান হত মুসলমানরা। ফলে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা সবথেকে বেশি ছিল, স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের পক্ষ থেকে। আর বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি মুসলমানদের লাভ হল না কিছুই। হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণকে সরিয়ে রাখলে সাদা চোখে এবং সদ্‌বুদ্ধিতে বাঙালি মুসলমানের অসহায় অবস্থান ধরা না পড়ে যাবে না। এখান থেকে শুরু। এরপর রাজনৈতিক স্থিরতা-অস্থিরতা, ভেদ-বিভেদ, পাওয়া-না পাওয়া এবং শেষে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবল হাওয়ায় দেশভাগ ও স্বাধীনতা। মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সমর্থনে মুসলিম লিগের ভোট-বৈতরণী পার।

পাকিস্তান অবশেষে হল। কিন্তু কীরকম পাকিস্তান? পুরোনো মানচিত্রে দেখা যেত ভারতের পূর্বদিকে কুক্ষিগত পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভয়ঙ্কর ফলাফল! পূর্ব পাকিস্তানে স্থানীয় শাসন নয়, পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করেছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। সে সরকারের প্রতিনিধিরা মূলত উর্দু ও পাঞ্জাবীভাষী। পাকিস্তানের শাসন যাঁদের হাতে তাঁরা শিক্ষিত মধ্য বা উচ্চবিত্ত মুসলমান এবং অবাঙালি। অর্থাৎ দেশভাগের আগে যেরকম পরেও সেই একই বিপন্নতায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান। উপরন্তু নতুন উপদ্রব ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন। আগুন জ্বলেছিল ঢাকার ময়দানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা', এই ঘোষণায়— সেই আগুনে আহুতি সম্পূর্ণ হল বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে। ২১ ফেব্রুয়ারি আসলে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক সর্বাত্মক আন্দোলনের স্মারক দিবস।

ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে 'সহনশীলতা'র প্রশ্ন কেন উঠছে সে কথা বলি। বাংলায় তুর্কী আক্রমণের পর থেকেই সম্ভবত বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবি, ফার্সির মিশ্রণ শুরু হয়। হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করতেন— যেমন আমরা বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এক মিশ্রিত জাতি,

আমাদের ভাষা বাংলাও তেমনি এক মিশ্রিত ভাষা। বাংলার উৎপত্তি গৌড় অপভ্রংশ থেকে। সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অতি দূরের; তবুও যেমন কেউ বড়ো মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেন আত্মগৌরবের জন্য, তা তিনি মেসোমশায়ের খুড়তুতো বোনের মামাশ্বশুরের পিসতুতো ভাই হোন না কেন, সেই রকমই আমরা বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কুটুম্বিতা পাতাই। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত হল বটে। বিশেষ করে সংস্কৃতের ঋণ বাংলা ভাষার আপাদমস্তক এমন ভারাক্রান্ত করেছে যে, সম্পর্কটা স্বীকার না করেই অনেকে পারেন না।... বাংলার গোড়ায় যে আর্য ভাষা, তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সেই আর্য ভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্য যুগে ফারসির ভিতর দিয়ে কিছু আরবি ও যৎসামান্য তুর্কি, এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগিজ আর ইংরেজি। দু-চারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্র ভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই।

বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন প্রসঙ্গে বাঙালির বিশেষ আপত্তি একটা সময় পর্যন্ত দেখা যায়নি; অথচ, আরবি, ফারসির ব্যবহারে 'যাবনী মিশাল' হয়ে যাচ্ছে বাংলাভাষা— এ বিখ্যাত উক্তি তো আমরা মধ্যযুগেই পেয়েছি [(কতভাবে বলি ভাষা যাবনী মিশাল: ভারতচন্দ্র]। ইউসুফ খানের আমলেই সম্ভবত বাংলা ভাষার প্রথম মুসলিম লেখক জয়নুদ্দীন 'রসুলবিজয়' কাব্যটি লেখেন। ইনিই সেই ইউসুফ খান যিনি মালাধর বসুকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যরচনার জন্য 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। সময়কালটা খেয়াল রাখতে হবে— পঞ্চদশ শতাব্দী [১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দ/ ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ]। শ্রীকৃষ্ণ এবং রসুলের বিজয়যাত্রা একসঙ্গে শুরু হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় [অন্তত পশ্চিমবাংলার মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে] তার বিশেষ সন্ধান মিলল না। সরাসরি 'মুসলমান কবিদের রচনা' প্রসঙ্গে আলোচনা সরে আসে সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার সাহিত্যচর্চা বিষয়ে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের উল্লেখে। অথচ মধ্যবর্তী শতকে সৈয়দ সুলতান, আলী রাজা, সা বিরিদ খান, শেখ চান্দ এবং দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ কাব্যরচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে সা বিরিদ খান 'বিদ্যাসুন্দরকাব্য'ও লিখেছেন, যেখানে তাঁর সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় প্রকট। তারপর আরাকান রাজসভার কাব্যচর্চা। আরাকানে মুসলমান-প্রভাব নষ্ট হবার পর বাংলাদেশে যখন অর্ধ-স্বাধীন সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাঙালি মুসলমান যে ধরনের সাহিত্যচর্চা করছিলেন তা বড়োই বিচিত্র! কেউ কেউ ধর্ম-সম্পর্কান্বিত কাব্য রচনা করেন, কেউ প্রাচীন নামপত্থের ধারা রক্ষা করেন, আবার বহুসংখ্যক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলিও লেখেন। তাঁদের মধ্যে

অনেকে বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসীও ছিলেন। বাংলায় প্রায় একশো মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়, যাঁরা বৈষ্ণবপদাবলীর পদ লিখেছেন। পূর্বোক্ত পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান লেখকেরা এই সময়ে ফারসি-উর্দু মিশ্রিত একধরনের বাংলায় পুথি রচনা করেন। যেগুলিকে তথাকথিত 'মুসলমানি বাংলা' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এখন অনাদৃত হলেও একসময়ে পল্লিবাংলার মুসলমান সমাজে সেগুলি বহুচর্চিত ছিল। 'আমীর হামজা', 'হাতেমতাই', 'কসাসুল আম্বিয়া'-র স্মৃতিকে উনিশ শতকের কোনো কোনো রচনায় উঁকি দিতে দেখা গেছে। বিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ নিয়ে লিখিত কথাসাহিত্যেও তার ছায়া যে পড়েনি তা নয়। যে 'মুসলমানি বাংলা'য় চেষ্টাকৃত সাহিত্যরচনা, সন্দেহ নেই, সে ভাষা মুসলমান বাঙালির মুখের ভাষা নয়। ঠিক যেমন নয়, সংস্কৃতঝঙ্কৃত সাহিত্যভাষা হিন্দু বাঙালির। হয়তো সমসময়েই সে ভাষার অসারতা বুঝেছিলেন অন্য লেখকেরা। হয়তো মুসলমান হওয়ার তাগিদ কখনও কখনও বাঙালি পরিচয়কে ম্লান করতে চেয়েছে, কিন্তু সাথে সাথেই বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে সে তাগিদকে। একটু উদ্ধৃত করি—

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মান না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়॥

উদ্ধৃতিটি 'নূরনামা'র লেখক নোয়াখালির সন্দ্বীপবাসী আব্দুল হাকিমের। তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি অর্থাৎ কিছু পরেই আমরা যে আলোচনায় যাব সেই 'মুসলমানি বাংলা' যে বিশ শতকে রাজনৈতিক কারণে তৈরি হয়নি তার একটা মুখবন্ধ তৈরি হয়ে রইল এখানে। বিপরীতক্রমে একটি অহংকারী উক্তিও হয়তো খুব বেমানান হবে না। উক্তিটি ভারতচন্দ্রের এবং অষ্টাদশ শতকেরই— 'কতভাবে বলি ভাষা যাবনী-মিশাল।' 'যাবনী-মিশাল' দেওয়া ভাষাতেও যে উৎকৃষ্ট বাংলা কবিতা লেখা সম্ভব তা তো এই 'হিন্দু কবি' দেখিয়েই গেছেন। 'যাবনী-মিশাল' বাংলায় শাক্তপদও কি রচিত হয়নি? আশ্চর্য এই যে সমস্ত মধ্যযুগ পর্যালোচনা করলে বাংলা সাহিত্য ও সমাজে একধরনের সহনশীল সামঞ্জস্যের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েই যাই।

প্রশ্ন উঠবে, সঙ্গত কারণেই, ঠিক কবে থেকেই বা এই সহনশীলতা, সমন্বয়ী ধারণার চরিত্র বদল ঘটল? উনিশ শতক বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক চূড়ান্ত

লালাগদল খাটায়। ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিল মূলত অর্থকৌলীন্য। জমিদারি, সেরেস্তাদারী, মহাজনী বা বিভিন্ন ব্যবস্থা-লব্ধ অর্থে পুষ্ট হিন্দু বাঙালি পাশ্চাত্যশিক্ষার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তখনকার সামাজিক ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে প্রাথমিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার পথে হেঁটেছিলেন মূলত সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বাঙালি। অবশ্য কখনো কখনো দরিদ্র মেধাবী হিন্দু বাঙালিও — বিদ্যাসাগর যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর ফল লাভ করেছিল হিন্দু সমাজ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সে শিক্ষার প্রাথমিক আলোক পৌঁছোতে হয়তো বিলম্ব হয়েছিল, হয়তো বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সময় লেগেছিল তার সুফল ফলতে, হয়তো এখনও পর্যন্ত মেয়েরা সামাজিকভাবে তার সার্বিক ফল পায়নি— তবুও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলকে হিন্দু বাঙালি সমাজ কোনো-ভাবেই উপেক্ষা করতে পারবে না। বিপরীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থকৌলীন্য না থাকায়, কিছুটা ঔদাসীন্য, অভিমান ও সামাজিক অন্যান্য বাধ্যতার কারণে মুসলমান বাঙালি সমাজ সাধারণভাবে এক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালির থেকে পিছিয়ে পড়েছিল।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল ফলতে লাগল সামাজিক ক্ষেত্রে। বিশেষত হিন্দু-বাঙালি মেয়েদের সামাজিক অবস্থান ও বৈষম্য নিয়ে নানা প্রকার বাদানুবাদ চলতে লাগল। সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহপ্রথা, বিধবাবিবাহ ঔচিত্য প্রসঙ্গ, নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি যে তর্জায় মাতলেন, সন্দেহ নেই তাতে হিন্দু বাঙালি মেয়েদের নয় নয় করেও কিছু উপকার হয়েছিল। বিপরীতক্রমে মুসলমান বাঙালি মেয়ে অশিক্ষা, সতীন সমস্যা, তালাক সমস্যা, পর্দাপ্রথার অতলে তলিয়েই থাকল। সমগ্র উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মেয়েরা উপেক্ষিতই থাকলেন। মুসলমান লেখকরা স্থিতাবস্থাকে ভাঙলেন না, নীরব থাকলেন— হিন্দু লেখকরা ভাবলেন না, নীরব থাকলেন। একমাত্র রোমান্সপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র একবার আয়েষা (সদার্থ/জন্মসূত্রে মুসলমান), একবার মতিবিবি (ধর্মান্তরিত মুসলমান)-কে নিয়ে কল্পনার চৌঘুড়ি ছোটালেন! [বেগম রোকেয়াই কেবলমাত্র সমগ্র বাঙালি মুসলমান মেয়েলি 'জাহানের' একমাত্র 'নূর'!]

কেন যে উনিশ শতক নিয়ে এই আলোচনার প্রয়োজন হল সেকথা একটু বলি। বাংলা সাহিত্য বলতে যদি হিন্দু বাঙালি বা উচ্চশিক্ষিত ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান বাঙালির রচনা হয়, তাহলে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মুসলমান সমাজ সেখানে অবহেলিত হবে। কিন্তু উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যচর্চার বাইরেও চর্চা চলছিল। উনিশ শতকে মুসলমান বাঙালির গদ্যচর্চার যে ধারা তার দুটি ভাগ ছিল — সমন্বয়ধর্মী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী। সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রধান পুরুষ মীর মোশাররফ

হোসেন; পরে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, শেখ ফজলুল করিম, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন প্রমুখেরা এই ধারার অনুবর্তী। স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুনসী মেহেরুল্লাহ্, পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দিন মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম, মুন্সি রেয়াজ উদ্দিন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

ইসলামকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার একটা প্রবণতা আমরা দেখি স্বাতন্ত্র্যধর্মী মুসলমান লেখকদের রচনায়। তার কারণ উনিশ শতকের ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভবত তাঁদের অস্বস্তিতে ফেলছিল। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'এসলাম তত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা সেই অস্বস্তি ও আশংকার প্রমাণ। বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম লেখক— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; মোতাহার হোসেন সু ফী; পৃ. ৩৩৩। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

"বহুদেশে এসলাম ধর্মের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎসংশোধনের জন্য আমরা এসলাম তত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ এরূপ একখানি গ্রন্থের আবশ্যকতা মুসলমান মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। আজকাল আমাদের শিক্ষিত মোসলমান ভ্রাতাদিগের মধ্যে 'স্বধর্মে অনাস্থা' একটি উৎকৃষ্ট রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার একমাত্র অবলম্বন তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন এসলামের অশেষ অমঙ্গলের কারণ। একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এসলাম ধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত থাকিলে, তাহারা কদাচ অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইত না। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই একটি 'নাস্তিকের'ও আবির্ভাব হইয়াছে। "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" এ কথার সত্যতা তাহারা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিতেছ। অপর এক সম্প্রদায় একেশ্বরবাদিত্বের ভান করিয়া ধর্ম প্রচারক ও তত্ত্ববাহকের (পয়গম্বরের) আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের দুই একটি মহাপুরুষ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া স্ব স্ব বিকৃত মস্তিষ্ক ও চিত্তদৌর্বল্যের পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। কেবল বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক গোপনে ব্রাহ্মমত স্বীকার করিতেছে। বাংলা ভাষায় এসলাম-ধর্ম বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি বর্তমানে থাকিলে তাহাদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়ত না। এই সকল লোকেরা যদি এসলাম ধর্মের সারমর্ম কিছুমাত্র অবগত থাকিত, তাহা হইলে কদাচ অধঃপাতে যাইত না। প্রকাশ্য ধর্মত্যাগী অপেক্ষা অপ্রকাশ্য ধর্মত্যাগীদের দ্বারা এসলাম সমাজের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। ইঁহারা বিড়াল তপস্বীর ন্যায় নীরবে অনেক যুবক ও বালকদিগকে স্বীয় মতাবলম্বী হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়া থাকে। এসলাম ধর্মাবলম্বীর অন্য ধর্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কারণ আর

কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাম ধর্মই প্রকৃত ধর্ম। যদি মানুষের জন্য কোনও ধর্ম থাকে, তাহা এসলাম ধর্ম।'

উনিশ শতকেই মুখ্যত ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যিক বৈরিতার সূচনা। যার প্রত্যক্ষ ফল দেখা গিয়েছিল 'হিন্দু বাংলা' ও 'মুসলমানী বাংলা' ভাষার দ্বন্দ্বে। খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় একবারও বললাম না সংস্কৃতকেন্দ্রিক বাংলা বা আরবি-ফারসি কেন্দ্রিক বাংলা। আমি বললাম, 'হিন্দু বাঙালির ভাষা' এবং 'মুসলমান বাঙালির ভাষা'। আমি এসব শব্দ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছি কারণ (১) এভাবেই রাজনৈতিক চিহ্নিতকরণ ঘটেছে বাংলা ভাষার এবং (২) এই রাজনৈতিক চিহ্ন লাঞ্ছিত ভাষায় আমরা এমন অভ্যস্ত যে আমাদের বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হয় না এইসব বিভাজনে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইতেও এভাবেই চিহ্নিত থাকে সাহিত্য কী পশ্চিমবঙ্গে; কী পূর্ববঙ্গে, অধুনা যা বাংলাদেশ।

বিশ শতকের সূচনা থেকেই ধর্ম প্রজ্ঞাপিত ভাষা-দ্বন্দ্ব সচেতনভাবেই শুরু হয়। যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় পাকিস্তান পর্বে। উনিশ শতকে প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত 'এসলাম তত্ত্ব' গ্রন্থেও যে ভাষা ব্যবহার দেখা যায়নি, দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বের বাংলায় এবং পাকিস্তান আমলের বাংলা ভাষার মাথায় সেই 'মুসলমানী ফেজ' বসিয়ে দেওয়া হল। নতুন-বাংলার-স্বয়ম্প্রকাশ-নিদর্শন সরকারি 'মাহে নও' মাসিকপত্রে মুদ্রিত একটি গল্পে নায়িকা নায়কের সামনে উপস্থিত। তার ক্রিয়াক্লান্ত ঘর্মাক্ত কলেবরের বর্ণনাটি এরকম— 'লেবাসের অন্দরে তার তামাম তনু পেশাসিনায় তরবতর', উদ্দীপনার সংগীতেও এই 'মুসলমানী জিঞ্জির'— ভাঙিল জিন্দান টুটিল জিঞ্জির,/আগে চল্ আগে চল্ আজাদ রাহাগীর।/জিন্দা গাজী ওরে, তুফানে ভয়ডর/ঝাণ্ডা হেলালী দুহাতে তুলে ধর।/আজাদী অভিযানে, কওমী আরমানে/আসুক সাহারায় প্লাবন বারিধির। ['রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ' সন্‌জীদা খাতুন ও 'বাঙালী ও বাংলাদেশ' সম্পা. অরুণ সেন, আবুল হাসনাত] হতে পারে এও এক প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া। বাঙালি পরিচয় সরিয়ে রেখে অনেকখানি মুসলমান হয়ে থাকা। বিপরীতক্রমে দেশভাগের পর হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু/শরণার্থীরাও অনেক বেশি হিন্দু পরিচয়ে থাকতে চেয়েছেন। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থে (The Marginal Men) দেখিয়েছেন প্রায় প্রতিটি হিন্দু উদ্বাস্তু কলোনিতে একটি করে কালীমন্দির স্থাপন করা হয়েছিল। বস্তুত বিশের শতকের প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের কল্যাণে হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালির চলার পথে ভিন্ন বাঁক নিল। যার প্রত্যক্ষ ফল ফলল ভাষায়।

এবার একটু অন্যদিক থেকে দেখার চেষ্টা করা যাক। ১৯০২ থেকে ২০০২ পর্যন্ত একশ' বছরের সময়কালকে সিকি শতক দিয়ে ভাগ করলে চারটি ভাগ পাওয়া যাবে। ১৯০২— কেন না সেটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রতিষ্ঠাবর্ষ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, গবেষণার জন্যই মুখ্যত এই 'পরিষৎ'-এর জন্ম। এর সঙ্গে পঁচিশ বছর যোগ করে পাওয়া যাবে ১৯২৭। পূর্ববঙ্গে 'শিখা' পত্রিকার পথচলা শুরু। ১৯২৬-এ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা হয়— মুক্তবুদ্ধির চর্চাই ছিল এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। আবদুল হুসাইন, কাজী মুতাহার হুসাইন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির প্রমুখেরা এই সাহিত্যসমাজের মুখ্য স্থপতি। 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন আবদুল কাদির। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমান্তরালে এই সাহিত্য পত্রিকা এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। 'শিখা'র আত্মপ্রকাশের সঙ্গে পঁচিশ বছর জুড়লে পাওয়া যাবে ১৯৫২। ভাষা আন্দোলনের বছর। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অল্পবিস্তর সবাই জানেন, তার প্রতিক্রিয়াও বহু আলোচিত, অতএব আরও পঁচিশ বছর যোগ করে দেওয়া যাক। পাওয়া যাবে ১৯৭৭ সাল। ১৯৫২-১৯৭৭ দুই বাংলাতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। ১৯৭১-এ অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম, ১৯৭৭-এ পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী ফ্রন্টের শাসনকাল শুরু। দুই বাংলাতেই আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ অবস্থান্তর ঘটায়। এর সঙ্গে আরও পঁচিশ যোগ করলে হয় ২০০২ সাল। পঁচিশ বছর করে এক একটা পর্যায় ধরে যদি বাংলা ভাষার চলনটা লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি পর্যায়ে শব্দ ব্যবহারে কীভাবে ধরা পড়েছে যুগমানস।

বিশের শতকে রবীন্দ্রনাথের প্রবল উপস্থিতিতে বাংলা ভাষা একধরনের মান্যরীতি তৈরি করেছে বলে বিশ্বাস। কিন্তু খেয়াল রাখলে দেখা যাবে সে রীতিতে পশ্চিমবাংলার সাহিত্য যতটা প্রভাবিত, সামগ্রিকভাবে পূর্ববাংলার সাহিত্য ততটা নয়— রবীন্দ্র সাহিত্যে ও ভাবনায় পূর্ববঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি সত্ত্বেও। এর কারণ কি এই যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা সচেতনভাবেই উপভাষাকে বর্জন করেছে? পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক গল্পেও তো চরিত্রের মুখে বাঙালি উপভাষা দেখা যায় না! উচিত ছিল তো। প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ছড়িয়ে থাকা উপকথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন বিভিন্নজনের মুখের গল্প থেকে। পরে সংগৃহীত কাহিনিগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করার সময়ে বহু চলিত শব্দ অবিকল রেখেছিলেন। অনেকের মনে থাকতে পারে— 'সন্ন্যাসী আশা দিয়া আম পাড়িলেন... বাক্যটি। ছবিও একটা ছিল। ঠাকুরমার ঝুলির পুরোনো বই-এর স্মৃতি যাঁদের আছে তাঁরা

মনে করতে পারবেন— সন্ন্যাসী একটা লাঠির মতো জিনিস নিয়ে আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন— লাঠিটার চেহারা যে ঠিক আঁকশির মতো অবিকল তা নয়— তবে অনুমান করা যেতে পারে ওই ধরনেরই কিছু হবে, আম যখন পাড়া হচ্ছে। কিন্তু শব্দটা ব্যবহার করলেন 'আশা'। 'আশা' তো বাংলা শব্দ হবে না নিশ্চয়ই! কিন্তু লেখার সময় শব্দটি ব্যবহার করলেন সহজেই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই ধরনের শব্দ ব্যবহার আমরা বিশেষ দেখি না। অথচ বাঙালি উপভাষার ব্যাপক ব্যবহার রবীন্দ্রনাথে প্রত্যাশিত ছিল! রবীন্দ্রনাথের চৌহদ্দিটা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রাচীরবেষ্টিত সীমানার মধ্যে কখনোই আবদ্ধ ছিল না তো! শিলাইদহ, শাজাদপুর, কালীগ্রাম, উত্তরবঙ্গ— ছড়ানোই তো ছিল। জমিদার হিসেবে নিজেকে কাছারিবাড়িতে আটকেও রাখেননি— ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রজাদের মধ্যে। প্রতিদিন প্রজাদের কথা শুনেছেন— প্রজারা তো কলকাতার ভাষায় কথা বলে নি নিশ্চয়! অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে বঙ্গালী উপভাষার নির্মম অনুপস্থিতি। সম্ভবত এই কারণেই অনেকদিন পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার মান্য কথাসাহিত্যে লোকভাষার স্বাভাবিক প্রকাশ বিশেষ ছিল না। বাংলা নাটক বরং রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। বিশেষত পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলা নাটক 'ড্রইংরুম সংস্কৃতি'কে উপেক্ষা করে জনতার দরবারে পৌঁছেছে জনতার ভাষা সম্বল করেই। পশ্চিমবাংলার নাটক সবসময়েই যে লোকভাষাকে অবিকল তুলে আনতে পেরেছে তা নয়, তবে প্রচেষ্টা ছিল।

যাহোক থেকে সাতাত্তর পশ্চিমবাংলার সাহিত্য লোকের মুখের কথার কাছাকাছি পৌঁছোবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছে। হতেও বা পারে বামপন্থী আন্দোলনই এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছে। বিপরীতে পূর্ববাংলার সাহিত্য প্রথমাবধি উপভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছে, এখনও তাই। বাহান্ন থেকে বরং ভাষার মুসলমানী বাহারী ফেজ খামিয়ে 'আমজামপাতার মুকুট' তুলে নিয়েছে মাথায়। অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ভাষা। না, এই স্বাভাবিকতা পশ্চিমবঙ্গের মান্য ভাষার স্বাভাবিকতা নয়, পূর্ববঙ্গের স্বাভাবিক বাংলা। তখন মুসলমান পরিচয়টা কিছুটা গৌণ— বাঙালি পরিচয়ই প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি।

পশ্চিমবাংলার পাঠক সাধারণভাবে মনে করেন বাংলাদেশের সাহিত্যে (১৯৭১-এর পর বাংলাদেশ-ই তো? পূর্ববঙ্গ তো আর থাকছে না।) 'গ্রাম্যতা' বেশি। না, এভাবে নয়, বরং বলা যাক, একটু বেশি গ্রামীণ। বলার সময় খেয়াল রাখতে ভুলে যান এখনও বাংলাদেশে কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লির মতো শহর নেই, আর না থাকাটাই স্বাভাবিক। গ্রাম অধিকাংশতই, কিছু মফস্সল, আর অল্প শহর। ঢাকা ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য শহর। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে 'শহরে'র

বিকল্প যে শব্দটা প্রায়ই ফিরে ফিরে আসে সেটা হল 'টাউন'। এই উল্লেখেই আশা করি অবস্থাটা স্পষ্ট হবে। বাংলাদেশের কবিতা অনেক আগে থেকেই আন্তর্জাতিক ও আধুনিক শব্দ ব্যবহারে পটু, নাটক— যে অর্থে পশ্চিমবাংলার নাটক নাগরিক, সে ধরনের নয়— তবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তার আপাত গ্রামীণ পটভূমিতেই বলা হয়ে যায়। কথাসাহিত্য, পশ্চিমবাংলার লোকেরা একটু উন্নাসিকভাবেই দেখেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, তাঁদের বঙ্গালী উপভাষা সম্পর্কে জ্ঞান কম বলেই। বাংলাদেশের কথাসাহিত্য অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। তুলনায় বরং পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্য সাধারণত শহুরে এবং অনেক ক্ষেত্রে শিকড়হীন। গ্রাম নিয়ে গল্প লিখতে হলে যে তার পরিবেশ-প্রতিবেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হয় সে ধারণা বরং পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রথিতযশা লেখকের কম। তারাশঙ্কর-সতীনাথ-মানিক-সমরেশ এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বরং বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে গল্প-লেখকেরা খুব ধীরে মুখ ফিরিয়েছেন। অতি সম্প্রতি কথাসাহিত্যে লোকভাষা ব্যবহারের ঝোঁক বেড়েছে। মালদা-মুর্শিদাবাদ, বীরভূম-বাঁকুড়া, মেদিনীপুর-পুরুলিয়া বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা যে একই বাংলায় কথা বলে না সে জ্ঞানের প্রকাশ পশ্চিমবাংলার কথাসাহিত্যিকদের রচনায় সাধারণত দেখা যায়নি।

২০০২ পর্যন্ত এসে আলোচনাটা শেষ হয়ে যাবারই কথা। তারপরও যেহেতু নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক এসেই পড়েছে উপসংহারটাও তাকে নিয়ে করাই ভালো। বিগত শতাব্দীর পঞ্চম/ষষ্ঠ দশক থেকেই এক ধরনের আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছে বাংলাভাষা, সে আগ্রাসন পূর্ববাংলায় যতটা প্রত্যক্ষ ছিল, পশ্চিমবাংলায় ততটা নয়। প্রত্যক্ষতা বরং ভালো প্রচ্ছন্নতার থেকে। পূর্ববাংলায় ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ ছিল প্রকট—উর্দু আগ্রাসন স্পষ্ট। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় হিন্দির আগ্রাসন প্রচ্ছন্ন। অতি ধীরে, তীক্ষ্ণ চতুরতায় এই ভাষা আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। না, আমি হিন্দি-বিরোধী নই। আমি জানি ভাষা নদীর মতোই বহতা। যত শাখানদী, উপনদীর জল মিশবে তত সমৃদ্ধ হবে। বাংলাভাষা এমনিতেই মিশ্রভাষা। সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হল, বাংলা ভাষার ব্যবহার, বাংলা শব্দের উচ্চারণ অনেকক্ষেত্রেই হিন্দির মতো হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্র, যাকে না পড়লে পিছিয়ে পড়তে হয়— এই আগ্রাসনের অন্যতম সহযোগী। প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্বতা থাকে, সেই নিজস্বতাই কোনো সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। আগন্তুক শব্দ এসে ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু আগন্তুক শব্দ তো আশ্রয়ী ভাষার বৈশিষ্ট্যে মিশে যাবে? এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। স্রোত বিপরীতমুখী হয়ে যাচ্ছে। এবিষয়ে বিশেষ ভাবনার প্রয়োজন আছে— বিশেষ উদ্যোগের।

ভাষা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল বলেই সম্ভবত বাংলাদেশীরা অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, আত্মবিশ্বাসী। ইংরেজি স্বাভাবিক নিয়মেই সামাজিক প্রশ্রয় বেশি পাবে—একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু সেজন্য তাদের মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকতে হয় না। বিপরীতে 'ভারতীয়ত্ব' বা 'সর্বভারতীয়তা'র মোহ উৎপাদনকারী রঙিন ফানুস পশ্চিমবাংলার বাঙালির জাতিসত্তাকে বিপন্ন করে তুলছে। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল না হলে জাতিসত্তা নির্মাণ করা যাবে তো?